গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ২৪ সংখ্যা | ২ - ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ইজরায়েলি শাসকদের সেবায় শ্রমিক পাঠাচ্ছে বিজেপি সরকার

তীব্র প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৫ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

সারা বিশ্বের জনগণ প্যালেস্টাইনের উপর মার্কিন মদতপুষ্ট ইহুদিবাদী ইজরায়েলি শাসকদের বর্বর আক্রমণের নিন্দা করছেন। তাদের আক্রমণে নারী-শিশু সহ হাজার হাজার নিরীহ প্যালেস্টিনীয় মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। প্যালেস্টিনীয় জনগণ তাঁদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য বছরের পর বছর ধরে ন্যায্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। ইজরায়েলি শাসকরা এই প্যালেস্টিনীয়দের ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস করে একটা জাতিকেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে।

গাজায় ১০০ দিনের বেশি আক্রমণের পরিণতিতে ইজরায়েলে শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে। যে হাজার হাজার প্যালেস্টিনীয় ইজরায়েলে কাজ করতেন, তাঁদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়াই সেখানে শ্রমিক সংকটের মূল কারণ। যুদ্ধের ফলে ৫ লক্ষ ইজরায়েলি ও ১৭ হাজারের বেশি বিদেশি শ্রমিক সে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এর উপর ইজরায়েলের প্রায় এক পঞ্চমাংশ কর্মক্ষম মানুষের স্থানচ্যুত হওয়া, স্কুল বন্ধ হওয়া, সেনাবাহিনীর রিজার্ভ হিসাবে বহু কর্মক্ষম মানুষকে তৈরি থাকতে বাধ্য করা ইত্যাদি কারণে সেখানে কাজ করার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে ভারতের বিজেপি সরকার ইজরায়েলের স্বৈরাচারী ইহুদিবাদী শাসকদের ত্রাতা হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে সস্তা শ্রমিক ইজরায়েলে সরবরাহ করছে। শত শত কর্মহীন যুবক এবং ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক

দুয়ের পাতায় দেখুন

আচ্ছে দিন, অমৃতকালের পর

নতুন ভাঁওতা কি রামরাজ্য

অভূতপূর্ব সমারোহে, বিপুল ব্যয়ে, তাক লাগানো প্রচারের মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠার পর বলেছেন, এর মধ্যে দিয়ে সূত্রপাত হল রামরাজত্বের।

প্রচলিত ধারণায় 'রামরাজত্ব' মানে কী? রামরাজত্ব বলতে যদি ভাবা হয় প্রজাবৎসল, ন্যায়নিষ্ঠ রাজার রাজত্ব অর্থাৎ এমন এক রাজত্ব বা দেশ, যেখানে মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করে, যেখানে রাজার সুশাসনে মানুষের কোনও অভাব থাকে না, খাওয়া-পরা-থাকার চিন্তা করতে হয় না, বিদ্বেষ-দ্বন্দ্ব না থাকায় যেখানে মানুষ শান্তিতে জীবন কাটায়, তাহলে তার সূচনা কী ভাবে কোন আশ্চর্য মন্ত্রে রামমন্দিরের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঘটল তা অবশ্য প্রধানমন্ত্রী বলেননি। ভারতবর্ষের বুকে এমন একটি স্বর্গরাজ্য নামিয়ে আনবেন কীভাবে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে কিছু বলেননি।

বিগত দশ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল এ দেশের শাসনক্ষমতায় রয়েছেন। সেই রাজত্বের দিকে তাকালেই প্রধানমন্ত্রী বর্ণিত রাম রাজত্বের কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস শাসনে নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের দুর্নীতি, কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছিল, ঠিক তখনই প্রতিশ্রুতির লম্বা তালিকা নিয়ে নির্বাচনী ময়দানে হাজির হয়েছিলেন বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি। সেই লম্বা তালিকার বেশির ভাগই আজ মানুষের মন থেকে হারিয়ে গেলেও বিশেষ কয়েকটির কথা মানুষ ভোলেননি। ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার সাধারণ মানুষকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে একশো দিনের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করবেন। বলেছিলেন, এক বছরের মধ্যে সমস্ত কালো টাকা বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনবেন এবং

ছয়ের পাতায় দেখুন

দেশ জুড়ে কৃষকদের ট্রাক্টর মিছিল

২৬ জানুয়ারি সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকে ট্রাক্টর মিছিল। ছবি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর। সংবাদ চারের পাতায়

'রামরাজ্য' থেকে যুদ্ধক্ষেত্রও ভাল!

দেশময় তীব্র বিতর্কের আবহে ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন হল অযোধ্যার রাম মন্দিরের। বিজেপি ও সংঘ পরিবারের নেতারা বলছেন তাঁদের বহু ঘোষিত 'রামরাজ্য' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে কার্যত বাস্তব।

কিন্তু কী আশ্চর্য! এ হেন 'রাম রাজ্য' ছেড়ে হাজার হাজার লোক বিদেশে ছুটছে কেন? বিজেপি শাসিত রাজ্য হরিয়ানা। রোহটক শহরে এমডি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে লক্ষ করা গেল হাজার হাজার যুবকের জটলা। তারা হরিয়ানা সরকারের বিজ্ঞাপন দেখে নাম লেখাতে এসেছেন। কাজের জন্য ইজরায়েলে যাবেন। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ক্যাম্প করে ছ'দিন ধরে নাম লেখানোর বিরাট কর্মসূচি। কিন্তু ইজরায়েলে যে চলছে যুদ্ধ পরিস্থিতি! তাতে কি? দেশে কর্মহীন অবস্থায় না খেয়ে-আধপেটা খেয়ে থাকার চেয়ে কাজ পেলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়াও শ্রেয়— সাংবাদিকদের কাছে বললেন এক কর্মপ্রার্থী।

৪২ বছরের যুবক জগদীশ প্রসাদ ইন্টারভিউ দিয়ে বেরিয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল— দেওয়াল কী করে প্লাস্টার করতে হয়। বোঝা গেল, রাজমিস্ত্রী, ছুতোর এই সমস্ত কাজের লোক নিচ্ছে ইজরায়েল। দ্বাদশ পাশ জগদীশ বললেন, দশ বছর ধরে এ কাজ করছি। আয় বেড়েছে হাজার চারেক টাকার মতো। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম এত বেড়েছে যে বেশি বেতনের কাজ না পেলে এই আয়ে সংসার চালানো যাচ্ছে না। দেশে বাড়তি বেতন না পেলে বিদেশেই যেতে হবে।

রাজস্থানের শিকার থেকে এসেছেন, ইতিহাসে এমএ ২৫ বছরের যুবক রামফল গেহলট। তিনি জানালেন, পাঁচবার সরকারি চাকরির জন্য পরীক্ষা দিয়েছি। একটাও হল না। তখন বাড়ির কৃষিজমিতেই কাজে লেগে যাই। কিন্তু পুঁজির অভাবের জন্য সেটাও করা গেল না। শেষে এক স্কিল ডেভলপমেন্ট সেন্টারে ভর্তি হই। ড্রাইভার এবং সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য আবেদন করি, তাও হল না। ইজরায়েলে স্টিল ফিক্সচারের কাজের জন্য আবেদন করেছেন তিনি।

ওড়িশা থেকে এসেছেন রবীন্দর প্রধান। তিনি এর আগে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, মরিশাসে কাজ করে এসেছেন। দশ মাস আগে পারমিট শেষ হয়ে যাওয়ায় দেশে ফিরে আসতে হয়েছে। বললেন, তখন থেকেই দেশে একটা কাজ খুঁজছেন। কিন্তু এই 'রাম রাজত্বে' উপযুক্ত বেতনের কাজ পাচ্ছেন না। ইজরায়েলে কাজ ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও সেখানে যাচ্ছেন একটু বেশি বেতনের আশায়। (সূত্র ঃ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ১৯ জানুয়ারি,২০২৪)

ইউরোপ, আমেরিকার সব দেশেই ভারতীয়

দুয়ের পাতায় দেখুন

মিড-ডে মিল কর্মীদের মিছিল

মিড ডে মিল কর্মী সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ 'মিড ডে মিল ঐক্য মঞ্চ'-এর নেতৃত্বে ২৯ জানুয়ারি শিশুদের মিড ডে মিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি, মিড ডে মিল কর্মীদের সরকারি স্বীকৃতি, বেতন বৃদ্ধি সহ সাত দফা দাবিতে ১৩ হাজার মিড ডে মিল কর্মী শিয়ালদা এবং হাওড়া স্টেশন থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মিছিল করেন এবং এসপ্ল্যানেডে ডোরিনা ক্রসিং দু'ঘণ্টা অবরোধ করেন। শিক্ষা দপ্তরের মুখ্যসচিবকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পরদিন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক দেখা করবেন এই প্রতিশ্রুতিতে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ সভা চলে এসপ্ল্যানেডের ওয়াই চ্যানেলে।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক সুনন্দা পণ্ডা সহ সহযোগী সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ।

ছবি আটের পাতায়

এতই যদি উন্নয়ন
তবে রিপোর্টে কেন কারচুপি

মোদি সরকারের দাবি, উন্নত থেকে উন্নততর দেশ হয়ে ওঠার পথে এগোচ্ছে ভারত। দেশের পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছনো শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাদের এই দাবি যদি সত্য হয় তা হলে অর্থনীতিতে এগোনোর সাথে সাথে তো দেশের মানুষের জীবনমান উন্নত হওয়ার কথা। শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, কেনার ক্ষমতা, সুস্থির পরিবেশ— সব কিছুরই অগ্রগতি ঘটার কথা। কিন্তু দারিদ্র, অনাহার, শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর মতো সূচকগুলিতে বিশ্বের নানা দেশের নিরিখে ভারত ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে কেন?

আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার, গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, গ্লোবাল হেলথ কেয়ার সিকিউরিটি ইনডেক্স এবং গ্লোবাল পিস ইনডেক্সে দেখা যাচ্ছে, কর্মসংস্থান, ক্ষুধা, প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু এবং শান্তি-সম্প্রীতির হারে ভারত রয়েছে পিছনের দিক থেকে এগিয়ে। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে ১২৫টি দেশের মধ্যে ১১১তম স্থানে রয়েছে ভারত। ইউনিসেফের রিপোর্ট বলছে, প্রতি মিনিটে দেশে এক জন করে শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। ২০২১ সালে গ্লোবাল হেলথ সিকিউরিটি ইনডেক্সে ভারত ১৯৫টি দেশের মধ্যে ছিল ৬৬তম স্থানে।

সম্প্রতি নীতি আয়োগের গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, মাল্টি-ডাইমেনশনাল পভার্টি ইন্ডেক্স অনুযায়ী ভারতে ২০১৩-১৪ সালের ২৯.১৭ শতাংশের তুলনায় ২০২২-২৩ এ বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক কমে দাঁড়িয়েছে ১১.২৮ শতাংশে। দারিদ্র যদি সত্যই এত বিপুল সংখ্যায় কমে থাকে, তবে প্রধানমন্ত্রীকে নতুন করে ৮০ কোটি মানুষের জন্য রেশন ঘোষণা করতে হল কেন? তবে কি তিনি তা অপ্রয়োজনেই ঘোষণা করলেন? অর্থাৎ যারা তাঁদের বিচারে দরিদ্র নয়, তাদের জন্যই এ 'অপচয়' করছেন? আর যদি তা না হয়, তা হলে কি ভোটের দিকে তাকিয়েই এই ঘোষণা করছেন তিনি? প্রধানমন্ত্রী কি এ প্রশ্নের জবাব দেবেন কেন মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের পরিবর্তে মন্দির নির্মাণকে সরকারের সাফল্য হিসাবে দেখাতে হচ্ছে?

বাস্তবে সাধারণ মানুষের নয়, পর্বতপ্রমাণ উন্নয়ন হয়ে চলছে আম্বানি-আদানিদের মতো একচেটিয়া পুঁজিপতিদের। প্রধানমন্ত্রী যে উন্নয়নের কথা বলছেন তা পুঁজির পাহাড়ে বসে থাকা ওই একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরই। সেটা দেখিয়েই নেতা-মন্ত্রীরা দেশের উন্নয়নের বিজ্ঞাপন দেন! এটাই সরকারের দেখানো বেশিরভাগ খালি একটি গ্লাসের নামমাত্র ভর্তি অংশ। গ্লাসের খালি অধিকাংশটা হল সাধারণ মানুষ, যাদের জীবনে উন্নয়নের ছিটেফোঁটা নেই। আর সরকারের স্ট্যাম্প গায়ে মেরে নীতি আয়োগও ঘোষণা করেছে, কারও বাড়িতে শৌচালয় থাকলে বা বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেই তাকে আর গরিব বলে ধরা হবে না। এই হাস্যকর মানদণ্ডে বিচার করলে দেশে গরিব খুঁজে পাওয়াই যাবে না। নীতি আয়োগের এই অবান্তর রিপোর্টকে দেখিয়ে সরকার যে দারিদ্র কমছে বলে দাবি করছে, তা যে কত অন্তঃসারশূন্য তার প্রমাণ অক্সফ্যাম রিপোর্ট। ২০২৩-এর অক্সফ্যাম রিপোর্ট বলছে, মাত্র ৫ শতাংশ নাগরিকের হাতে জমা হয়েছে দেশের মোট সম্পদের ৬০ শতাংশ। আর নিচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষের জন্য জুটেছে তার মাত্র ৩ শতাংশ।

তা হলে দেশের কোটি কোটি শ্রমিক-কৃষক প্রতিদিন তাদের শ্রম দিয়ে যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে, সে সব যাচ্ছে কোথায়? শ্রমজীবী মানুষের পরিশ্রমে তৈরি সেই সম্পদ আত্মসাৎ করছে পুঁজিপতিরা। সেই সম্পদ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির ভাণ্ডারে জমা হয়ে আকাশচুম্বী হচ্ছে। পুঁজিপতিদের এই সম্পদবৃদ্ধি যাতে অবাধ হয় তার জন্য আইনি ও বেআইনি সব রকম ভাবে সাহায্য করছে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলি। সেজন্য সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র— তেল, গ্যাস, খনি, ব্যাঙ্ক, বিমা, রেলকে বেচে দিচ্ছে শিল্পপতির কাছে। সম্প্রতি দাভোসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের রিপোর্ট এই বিষয়টিকে সত্য প্রমাণ করে বলেছে, সকলের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না। গরিব ও নিম্নবিত্তরা থেকে যাচ্ছে উন্নতির বাইরে।

যতই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির উন্নয়নকে 'দেশের উন্নয়ন' হিসাবে দেখান প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা, তাতে কোনও ভাবেই চাপা দেওয়া যাচ্ছে না বেকারি, দারিদ্র, অনাহারে পিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণাকে।

বারুইপুরে এসডিও অভিযান

স্মার্ট মিটার, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি, জাতীয় শিক্ষানীতি চালুর প্রতিবাদ সহ ১২ দফা দাবিতে ১০ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বারুইপুর এসডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান এসইউসিআই(সি)-র। বক্তব্য রাখেন বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস সুবীর দাস ও গোপাল সাহু এবং জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী।

ইজরায়েলে শ্রমিক পাঠাচ্ছে সরকার

একের পাতার পর

জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ইজরায়েলে কাজের আশায় লাইন দিচ্ছেন। ইজরায়েলের অমানবিক শাসকদের মদত দেওয়ার জন্য বিজেপি সরকারের এই নিষ্ঠুর আচরণের আমরা তীব্র নিন্দা করছি। সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, ভারতীয় শ্রমিকদের এ ভাবে বিদেশে চালান করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সামিল হোন।

যুদ্ধক্ষেত্রও ভাল

একের পাতার পর

শ্রমশক্তি ছুটছে। কিছু দিন আগে ফ্রান্স থেকে একটি যাত্রী বোঝাই বিমান ভারতে ফেরৎ পাঠানো হয় মানব পাচারের অভিযোগে। মুম্বই বিমনবন্দরে সেটি অবতরণ করার পর দেখা গেল, যাত্রীদের অধিকাংশই গুজরাটের। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিকারাগুয়া হয়ে আমেরিকা বা কানাডায় ঢুকে পড়া, যাতে কিছু কাজ পাওয়া যায়। জানা যাচ্ছে একটা এজেন্সি এর সঙ্গে যুক্ত। ভারতীয় শ্রমিকরা নিজেদের জমানো টাকার সবটুকু দিয়ে এই সব এজেন্সির মাধ্যমে কাজে পাড়ি দিচ্ছেন দেশে দেশে।

আমেরিকার কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার পেট্রল-এর তথ্যানুসারে ২০২৩ সালে ৯৬,৯১৭ জন ভারতীয় বেআইনিভাবে আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করেছেন যা গত বছরের থেকে ৫১.৬১ শতাংশ বেশি। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, এর মধ্যে ৪১,৭৭০ জন মেক্সিকোর বর্ডার দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছেন।

এই তথ্যগুলি কী দেখাচ্ছে? এতগুলো বছর ধরে নরেন্দ্র মোদিজির ভাইব্র্যান্ট গুজরাটের প্রচারের পর সেখানে এমন উন্নয়ন হয়েছে যে কাজের খোঁজে দলে দলে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে ছুটছে! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় দেশ ছেড়ে বেআইনি অভিবাসনের ঝুঁকি নিয়েও বিদেশে ছুটছেন কেন? এ প্রশ্ন দেশের মানুষকে গভীর ভাবে ভাবাচ্ছে।

জীবনাবসান

নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার এসইউসিআই(সি)-র প্রবীণ কর্মী কমরেড বিজয় দে দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৩ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনের সময়ে কলকাতার উল্টোডাঙায় তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। কিছুদিন পর জীবিকার সন্ধানে তিনি দুর্গাপুরে যান এবং সেখানে দলের কাজে যুক্ত হন। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন স্বৈরাচারী কংগ্রেস সরকার কর্তৃক পশ্চিমবাংলার প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিলে তার প্রতিবাদে আন্দোলনে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং তিনি বেশ কিছুদিন জেলে ছিলেন।

১৯৭৬ সালে তিনি নদীয়ার রানাঘাটে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং বই, কলম প্রভৃতি হকারি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। চরম অভাব ও দারিদ্র্য তাঁকে কোনও দিন দলের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। দলের কর্মীদের নিজের বাড়িতে খাওয়াতে পারলে তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন। দুই ভাই এবং স্ত্রী-সন্তান সহ পরিবারকে দলের সঙ্গে যুক্ত করায় তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। দলের প্রথম পার্টি কংগ্রেসের সময় তিনি দলীয় সদস্যপদ পান এবং রানাঘাট লোকাল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। জুনিয়র কমরেডদের নেতৃত্ব মেনে নিতেও তাঁর কোনও সমস্যা হত না। দীর্ঘ রোগভোগ সত্ত্বেও সদা হাস্যময়, বিনম্র স্বভাবের মানুষ কমরেড বিজয় দে রানাঘাটের সকল কমরেডের মনে স্থান করে নিয়েছিলেন।

কমরেড বিজয় দে লাল সেলাম

বীরভূম জেলার মুরারই থানার মিত্রপুর অঞ্চলে দলের প্রবীণ কর্মী কমরেড জিগর হোসেন ১৬ জানুয়ারি জঙ্গিপুর হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। অসুস্থতা ও বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি দীর্ঘদিন প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। তাঁর মরদেহ বাড়িতে আনার পর দলের কর্মী, সমর্থক সহ বহু মানুষ শ্রদ্ধা জানান। লোকাল সম্পাদক কমরেড গোলাম মুজতবা সহ অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড জিগর হোসেন '৬৬ সালে ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের সময় দলের সাথে যুক্ত হন। প্রয়াত নেতা কমরেড জিয়াদ আলি বক্সীর উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি এবং পিতৃসুলভ স্নেহে গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁর মাধ্যমেই মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং সক্রিয় কর্মী হিসেবে দলের কাজে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাহসিকতা, স্পষ্ট ও সত্যবাদিতা, গরিব মানুষের প্রতি দরদি মন ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সময়ে এলাকায় খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। কংগ্রেস, সিপিএমের শাসনে জোতদার বাহিনী, কায়েমি স্বার্থবাদীদের দ্বারা পার্টি সংগঠনের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন। শয্যাশায়ী অবস্থাতেও তিনি কর্মীদের উৎসাহিত করে গিয়েছেন পার্টির কাজে। নিয়মিত গণদাবী সংগ্রহ করে পড়তেন, দলের কথা আলোচনা করতেন, খোঁজখবর নিতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন নির্ভরযোগ্য কমরেডকে হারাল।

কমরেড জিগর হোসেন লাল সেলাম

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (১৫)

ভি আই লেনিন

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ বার পঞ্চদশ কিস্তি।

মানুষের বিরুদ্ধে সমস্ত ধরনের বলপ্রয়োগের বিলোপ ঘটানোই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য

গণতন্ত্রকে পরাস্ত করা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস

এই বিষয়টি নিয়ে এঙ্গেলস তাঁর মত প্রকাশ করেন 'সোসাল-ডেমোক্র্যাট' কথাটি যে বিজ্ঞানের দিক থেকে ভুল, সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে।

১৮৭০-এর দশকে নানা বিষয়ে, প্রধানত 'আন্তর্জাতিক' বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলির এক সংকলনের ভূমিকা লেখেন এঙ্গেলস। ১৮৯৪-এর ৩ জানুয়ারি, অর্থাৎ মৃত্যুর দেড় বছর আগে লেখা এই ভূমিকাটিতে তিনি বলেন যে, সমস্ত প্রবন্ধে তিনি 'সোসাল ডেমোক্র্যাট' কথাটি না লিখে 'কমিউনিস্ট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কারণ, ওই সময়ে ফ্রান্সে প্রুধোঁপন্থীরা এবং জার্মানিতে লাসালের অনুগামীরা নিজেদের সোসাল ডেমোক্র্যাট বলতেন।

এঙ্গেলস লিখেছেন, "আমাদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য মার্ক্স ও আমার পক্ষে তাই এমন একটি নমনীয় শব্দ নির্বাচন করা সম্ভব ছিল না। আজকাল ব্যাপার অন্য রকম। এই কথাটি (সোসাল ডেমোক্র্যাট) হয়ত এখন উতরে যাবে। যদিও যে পার্টির অর্থনৈতিক কর্মসূচি সাধারণভাবে শুধু সমাজতান্ত্রিক নয় বরং সরাসরি কমিউনিস্ট, যার চূড়ান্ত রাজনৈতিক লক্ষ্য হল গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এবং সেই অর্থে গণতন্ত্রকেও পরাস্ত করা, তেমন পার্টির ক্ষেত্রে এই নাম অনুপযুক্ত। যাই হোক, *প্রকৃত* (শব্দটি এঙ্গেলসই বাঁকানো হরফে লিখেছেন) রাজনৈতিক দলের নাম কখনওই সম্পূর্ণ যথাযথ হয় না। পার্টি বিকাশ লাভ করে, নাম চালু থেকে যায়।"

দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক এঙ্গেলস জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দ্বন্দ্বতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলেছেন, মার্ক্স ও আমি পার্টির জন্য বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যথাযথ একটা চমৎকার নাম ঠিক করেছিলাম, কিন্তু কোনও যথার্থ পার্টি, সর্বহারার গণপার্টি ছিল না। এখন (উনিশ শতকের শেষ ভাগে) একটা যথার্থ পার্টি আছে, কিন্তু তার নাম বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যথাযথ নয়। তবে ভাবনা নেই, ওতেই 'কাজ চলে যাবে'। শুধু যদি পার্টিটা বাড়ে, তার নামটি যে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সঠিক নয়, শুধু যদি তা পার্টির কাছে গোপন না থাকে এবং পার্টির সঠিক পথে বিকাশে তা বাধা সৃষ্টি না করে, তবে সেই নামেই কাজ চলে যাবে!

কোনও রসিক ব্যক্তি এঙ্গেলসের ধরনে আমাদের বলশেভিকদের হয়তো এই বলে সান্ত্বনা দেবেন যে, আমাদের একটা প্রকৃত পার্টি আছে, চমৎকারভাবে সেই পার্টি বাড়ছে। ১৯০৩ সালে

ব্রাসেলস-লন্ডন কংগ্রেসে ঘটনাচক্রে আমরা ছিলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ[১]। 'বলশেভিক' শব্দটিতে এই আকস্মিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া অন্য কিছু না বোঝালেও এ রকম একটি অর্থহীন ও কদাকার শব্দই পরীক্ষায় 'উতরে যাবে'। জুলাই ও আগস্ট মাসে[২] প্রজাতন্ত্রী ও 'বিপ্লবী' পেটি বুর্জোয়াদের গণতন্ত্র আমাদের দলের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে, তাতে 'বলশেভিক' নামটি এখন সর্বত্রই শ্রদ্ধাস্পদ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়াও, আমাদের দল সত্যকার বিকাশের পথে যে বিরাট ঐতিহাসিক অগ্রগতি ঘটিয়েছে, এই নির্যাতন তারই সঙ্কেত। এপ্রিল মাসে পার্টির নাম বদলের যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, এই অবস্থায় সেই প্রস্তাবে অনড় থাকতে আমিও এমনকি দ্বিধাবোধ করব। কমরেডদের কাছে আমি হয়তো একটা 'আপসে'র প্রস্তাব দেব, অর্থাৎ আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি নামে অভিহিত করে বন্ধনীর মধ্যে 'বলশেভিক' কথাটা রাখার প্রস্তাব দেব।

কিন্তু, রাষ্ট্রের প্রতি বিপ্লবী সর্বহারার মনোভাবের তুলনায় পার্টির নামের প্রশ্নটি কম গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রচলিত আলোচনায় বরাবর যে ভুলটি করা হয়, তার বিরুদ্ধে এঙ্গেলস হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এবং কথা প্রসঙ্গে তা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এই ভুলটি হল ঃ নিরন্তর ভুলে যাওয়া হয় যে রাষ্ট্রের বিলোপ মানে গণতন্ত্রেরও বিলোপ, ক্ষয় পেতে পেতে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মানে গণতন্ত্রেরও ক্ষয় পেতে পেতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া।

প্রথম দৃষ্টিতে এই কথাকে মনে হবে চূড়ান্ত রকমের অদ্ভুত ও অবোধ্য। এমনকি কেউ কেউ হয়তো এমন আশঙ্কা করতে পারেন যে, আমরা এমন এক সমাজব্যবস্থার আবির্ভাব আশা করছি যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সংখ্যালঘিষ্ঠের অধীনতার নীতি মানা হবে না। কারণ, গণতন্ত্র মানে এই নীতিকেই স্বীকৃতি দেওয়া নয় কি?

না, গণতন্ত্র আর সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সংখ্যালঘিষ্ঠের আনুগত্য এক নয়। গণতন্ত্র হল একটা রাষ্ট্র, যেখানে সংখ্যাগুরুর প্রতি সংখ্যালঘু আনুগত্য স্বীকার করে। অর্থাৎ গণতন্ত্র হল এক শ্রেণি কর্তৃক অপর শ্রেণির বিরুদ্ধে, জনসাধারণের এক অংশ কর্তৃক অপর অংশের বিরুদ্ধে নিয়মিত ভাবে বলপ্রয়োগের এক সংগঠন।

রাষ্ট্রের বিলোপ, অর্থাৎ সমস্ত সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বলপ্রয়োগের, সাধারণ ভাবে মানুষের বিরুদ্ধে সমস্ত ধরনের বলপ্রয়োগের বিলোপ ঘটানোই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে আমরা স্থির করেছি।

আমরা এমন একটি সমাজব্যবস্থার উদ্ভব আশা করি না যেখানে সংখ্যাগুরুর প্রতি সংখ্যালঘুর আনুগত্যের নীতি মেনে চলা হবে না। কিন্তু সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করতে করতে আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, এই সমাজ বিকশিত হতে হতে সাম্যবাদী সমাজে রূপান্তরিত হবে। এবং তাই, সাধারণভাবে মানুষের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের কোনও প্রয়োজন থাকবে না। একজনের প্রতি আরেক জনের, এক অংশের মানুষের প্রতি অপর অংশের মানুষের বশ্যতার প্রয়োজন লোপ পাবে। কারণ, বলপ্রয়োগ ছাড়াই, বশ্যতা ছাড়াই জনসাধারণ সামাজিক জীবনের প্রাথমিক শর্তগুলি পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

অভ্যাসের এই বিষয়টিতে জোর দেওয়ার জন্য এঙ্গেলস এক নতুন প্রজন্মের কথা বলেছেন, যে প্রজন্ম "নতুন ও স্বাধীন সামাজিক পরিবেশে লালিত পালিত হবে", যে প্রজন্ম গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র সহ সব ধরনের রাষ্ট্রকে, "রাষ্ট্রের গোটা জঞ্জালস্তূপকে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে সক্ষম হবে"।

এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করার জন্য রাষ্ট্রের ক্রমে ক্ষয় পেতে পেতে অবলুপ্ত হওয়ার অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রশ্নটি আলোচনা করা প্রয়োজন। (চলবে)

১ ঃ এখানে ১৯০৩-এর জুলাই-আগস্টে অনুষ্ঠিত রুশ সোসাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের কথা বলা হয়েছে। এই কংগ্রেস প্রথম বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে বসে। কিন্তু পুলিশের তাড়ার কারণে জায়গা পরিবর্তন করে লন্ডনে কংগ্রেস হয়।

পার্টির ইতিহাসে এই দ্বিতীয় কংগ্রেস বিরাট ভূমিকা পালন করে। এই কংগ্রেসেই কার্যত রুশ সোসাল ডেমেক্র্যাটিক লেবার পার্টি (আরএসডিএলপি) গঠিত হয়। এই কংগ্রেসেই দলের কর্মসূচি ও নিয়ম-নীতি গৃহীত হয়েছিল এবং পার্টির কেন্দ্রীয় প্রধান অঙ্গগুলি গঠিত হয়েছিল। আরএসডিএলপি-র মধ্যে লেনিন-নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী ধারা ও মার্তভ-নেতৃত্বাধীন সুবিধাবাদী ধারা— এই দুই ধারার মধ্যে মূলত সংগঠনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম শুরু হয় এই কংগ্রেসেই।

পরিণামে পার্টি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়— বলশেভিক ও মেনশেভিক। পার্টির কেন্দ্রীয় প্রধান অঙ্গগুলির নির্বাচনী ফলাফলের সঙ্গে এই নামদুটি যুক্ত। এই কংগ্রেসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে লেনিনের অনুগামীরা যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়েছিলেন, সেই সময় থেকে তাঁদের 'বলশেভিক' নামে ডাকা হতে থাকে (রুশ ভাষায় বলশেভিক কথাটির অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ), এবং লেনিনের বিরোধীরা যারা নির্বাচনে কম ভোট পেয়েছিল, সেই সময় থেকে তাঁদের 'মেনশেভিক' বলা শুরু হয় (রুশ ভাষায় মেনশেভিক মানে সংখ্যালঘিষ্ঠ)।

২ ঃ এখানে ১৯১৭ সালের ৩-৫ জুলাই পেট্রোগ্রাদের ঘটনাগুলির কথা বলা হয়েছে। সেই সময় সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে শ্রমিক ও সৈন্যরা বড় বড় মিছিলে সামিল হচ্ছিলেন। শান্তিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, কেরেনস্কির নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকার মিছিলের উপর সৈন্য লেলিয়ে দিয়েছিল।

মিছিল বন্ধ করে দেওয়ার পর সরকার বলশেভিক পার্টির উপর নির্যাতন চালাতে থাকে। তারা বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'প্রাভদা' বন্ধ করে দেয় এবং লেনিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। লেনিন আত্মগোপন করতে বাধ্য হন।

বলশেভিক পার্টির সামনের সারির বেশ কয়েকজন নেতা গ্রেপ্তার হন। এ সব সত্ত্বেও লেনিন ও স্ট্যালিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি ১৯১৭ সালে অক্টোবর (নভেম্বর) বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণির জয়লাভের ক্ষেত্র প্রস্তুতে সমর্থ হয়।

পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে হামলা
তীব্র নিন্দা সিপিডিআরএস-এর

মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক ২৬ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

'গত ২৩ জানুয়ারি পুনে ফিল্ম ইন্সটিটিউটে এবিভিপি-র লোকজন হামলা চালিয়ে নির্বাচিত ছাত্র সংসদের সভাপতি সহ পড়ুয়াদের মারধর করে। 'বাবরি ফিরে দেখা ঃ সংবিধানের মৃত্যু' শীর্ষক ব্যানার, পোস্টার ছিঁড়ে দেয়। 'রাম কে নাম' চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বন্ধকরে দেয়। ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরের ঘরেও হামলা চালায়। বহু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নষ্ট করে দেয়। এই ঘটনা দেখাচ্ছে স্বাধীন মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার আজ ভূলুণ্ঠিত।

আমরা হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং স্বাধীন মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার রক্ষা করার জন্য সর্বস্তরের নাগরিকদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই।'

দেশ জুড়ে নেতাজি জন্মজয়ন্তী

ধর্ম এবং রাজনীতিকে মিলিয়ে দিয়ে যেভাবে ভোটব্যাঙ্ক তৈরির অপরাজনীতি চলছে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সারা জীবন ধরে তার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়, রাজনীতিতে তাকে টেনে আনা উচিত নয়। রাজনীতির চলা উচিত অর্থনীতি এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে ভিত্তি করে। তিনি হিন্দু এবং মুসলমানের স্বার্থ পরস্পরের পরিপন্থী বলেও মনে করতেন না। স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসহীন বিপ্লবী ধারার নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রকৃত

চিত্তরঞ্জন পার্ক, দিল্লি

এলাহাবাদ

শিক্ষা ও তাঁর শোষণহীন ভারত গড়ার স্বপ্নকে ভুলিয়ে দিতে সচেষ্ট শাসকদলগুলি। তারা নিছক কিছু আড়ম্বরের মধ্যে নেতাজি-চর্চা চাপা দিতে বদ্ধপরিকর।

এই মহান মানুষটির সংগ্রামকে দেশের মানুষের বিশেষত ছাত্র যুব সমাজের মধ্যে জাগরূক রাখার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস-এর মতো সংগঠনগুলি। এদের পক্ষ থেকে ২৩ জানুয়ারি ১২৭তম নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, বাজার-স্টেশন-মোড়-পার্ক সহ কয়েক হাজার জায়গায় নেতাজির ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ ছাড়াও অসংখ্য আলোচনা সভা, উদ্ধৃতি ও ছবি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই ধরনের কর্মসূচি জানুয়ারি মাসের বাকি দিনগুলি ধরে চলে।

শ্যামবাজারে নেতাজি মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় এবং এসইউসিআই (সি)-এর কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সমরেন্দ্র প্রতিহার। মৌলালি যুবকেন্দ্রের অ্যানেক্স হলে সারা বাংলা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটির উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন ডিরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন ডাঃ মনোজ ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন প্রধান, অধ্যাপক মনোজ গুহ ও কমিটির সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত।

মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর বৃত্তি পরীক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে শহিদ মোড়ে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশ্বজিত সাহা, উজ্জ্বলেন্দু সরকার প্রমুখ। সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পিপলা গ্রামে নেতাজি জন্মদিবস উদযাপিত হয়। শিবমন্দির পাড়ায় নেতাজির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ছাত্র-যুব-মহিলারা। নেতাজির মূল্যবান উদ্ধৃতির প্রদর্শনী করেন উদ্যোক্তারা।

জৌনপুর, উত্তর প্রদেশ

চিত্তরঞ্জন পার্ক, দিল্লি ঃ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস মেমোরিয়াল অল ইন্ডিয়া কমিটির উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারি দিল্লির সি আর পার্কে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নেতাজি পার্কে মূর্তি ও প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান দিল্লি ইউনিভার্সিটির পূর্বতন অধ্যাপক শুভেন্দু ঘোষ, ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির পূর্বতন বিজ্ঞানী অধ্যাপক অমিতাভ বসু, কমিটির সর্বভারতীয় কার্যকরী সদস্য ঋতু কৌশিক, দীনেশ মহন্ত ও প্রশান্ত কুমার প্রমুখ। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক অমিতাভ বসু ও ঋতু কৌশিক। ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এরপর প্রভাত ফেরি এবং নেতাজির ছবি সংবলিত ব্যাজ পরানো হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ১২৫তম জন্মবার্ষিকী কমিটি, দিল্লির সম্পাদক সুমন।

ত্রিনগর ঃ দিল্লির 'শহিদ ও মনীষী স্মরণ সমিতি'র উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারি ত্রিনগরে নেতাজির জীবনসংগ্রাম সংক্রান্ত ছবি ও তাঁর অমূল্য উদ্ধৃতি প্রদর্শিত হয়। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানোর পর বক্তব্য রাখেন সমিতির সম্পাদক ম্যানেজার চৌরাসিয়া, প্রকাশ দেবী, সুরেশ সৈনী প্রমুখ। বহু সাধারণ মানুষ অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন।

জৌনপুর, উত্তরপ্রদেশ ঃ ২৩ জানুয়ারি স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন বীর যোদ্ধা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইকেকেএমএস এবং কমসোমলের উদ্যোগে জৌনপুরের বদলাপুরে সব্জি মান্ডির পাশে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আগে নেতাজির প্রতিকৃতি ও নানা ব্যানারে সজ্জিত মিছিল পথ পরিক্রমা করে।

জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জওয়াহিরলাল মিশ্র, ইন্দুকুমার শুক্ল এবং সন্তোষ প্রজাপতিকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। বক্তব্য রাখেন রবিশঙ্কর মৌর্য, মিথিলেশ মৌর্য, দিলীপ কুমার, রাজেন্দ্র প্রসাদ তিওয়ারি প্রমুখ। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইডিএসও-র পূর্বতন সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র। সভায় বিপুল সংখ্যায় ছাত্র, যুব, কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন।

এলাহাবাদ ঃ অধিবক্তা মঞ্চের উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারি আইনজীবীরা এলাহাবাদের সিভিল লাইন্সে নেতাজি সুভাষ চৌরাহাতে পৌঁছে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। সেখানে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ আইনজীবী কে কে রায়। সভা পরিচালনা করেন অধিবক্তা মঞ্চের সংযোজক রাজবেন্দ্র সিং।

শ্যামবাজার মোড়, কলকাতা

এই উপলক্ষে ২৫ জানুয়ারি 'সৃজন এক পহল, এলাহাবাদ' পত্রিকার পক্ষ থেকে একটি কাব্যপাঠ ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন বিজয় শঙ্কর সিং। আলোচনা করেন মিথিলেশ ভক্ত। সভা পরিচালনা করেন বিকাশ কুমার মৌর্য।

লিগাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। কিছু আইনজীবী ও শিক্ষকদের উদ্যোগে দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্টের সামনে মাল্যদান অনুষ্ঠান হয়

সুপ্রিম কোর্টের সামনে

ডায়মন্ডহারবার কোর্টে

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক কেন্দ্রিকরণের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ 'ন্যায়পাল' নয়, শূন্যপদে স্থায়ী উপাচার্য, অধ্যাপক নিয়োগ এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ চাই।
২৯ জানুয়ারি এআইডিএসও-র ডাকে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ও জেলায় জেলায় ছাত্র বিক্ষোভ হয়
ছবি ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দেশ জুড়ে ট্রাক্টর মিছিলে সামিল কৃষকরা

দেশের জনগণ এবং কৃষকদের প্রতি মোদি সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে, দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে কৃষকদের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের চুক্তিগুলি বাস্তবায়িত করা, নয়া শ্রম কোড, বিদ্যুৎ বিল ২০২০ ও স্মার্ট মিটার বাতিল, সারের কালোবাজারি বন্ধ, উত্তরপ্রদেশে লখিমপুর খেরিতে ৮ কৃষককে হত্যায় অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপি নেতা অজয় মিশ্র ও তার পুত্রকে গ্রেপ্তার করা, দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্বের উপর থেকে সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ২৬ জানুয়ারি সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতৃত্বে এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সহযোগিতায় দেশের জেলায় জেলায় ট্রাক্টর,

মোটর সাইকেল ও সাইকেল মিছিল হয়।

পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও ব্লকগুলিতে এআইকেকেএমএস-এর উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কোচবিহার, নদিয়া (ছবি), উত্তর ২৪ পরগণা ইত্যাদি জেলায় শত শত চাষি ও খেতমজুর এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

মর্যাদাময় জীবনের সন্ধানে এসেছিলেন ওঁরা লেনিন স্মরণ সমাবেশে

২১ জানুয়ারি, দুপুর সাড়ে বারোটা। এসপ্ল্যানেড মেট্রোর শহিদ মিনার গেট দিয়ে বেরোতেই কানে এল সমবেত কণ্ঠের গান—
‘মেঘের ওপার থেকে বজ্রনিনাদ ধ্বনি বাজে
তরঙ্গ উত্তাল প্রশান্ত সাগরের মাঝে,
দৃঢ় কদম, বুকে বল
ওই সৈন্যদল অবিচল,
আছে সবার সামনে দাঁড়িয়ে কমরেড লেনিন
আছে রক্তপতাকা হাতে দাঁড়িয়ে কমরেড লেনিন।’

ঘুম ভাঙানো গান, রক্তে শিহরণ জাগানো সুর। শহিদ মিনার ময়দান থেকে সেই দৃপ্ত সুরের ঢেউ ছড়িয়ে যাচ্ছে ধর্মতলা বাসস্ট্যান্ড চত্বর ছুঁয়ে আরও দূরে, যতদূর মাইকের আওয়াজ শোনা যায়।

শহিদ মিনার ময়দান। ২১ জানুয়ারি

পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত প্রত্যন্ত থেকে হাজারে হাজারে মানুষ হাড় কাঁপানো শীত ঠেলে ঢুকে পড়ছেন ময়দানের প্রাঙ্গণে, যেখানে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের আহ্বানে পালিত হচ্ছে কমরেড লেনিনের প্রয়াণ শতবর্ষ।

এ দিনের শহিদ মিনার ময়দান যেন শীতের কলকাতার বুকে এক টুকরো রেড স্কোয়ার। লাল কাপড়ে মোড়া বিশাল মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা, বিশ্বের প্রথম শোষণহীন সমাজ গড়ার কারিগর ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। গণসঙ্গীতের সুর, দৃপ্ত স্লোগান আর বিপুল জনসমাগমের আবহে সে ছবি আরও জীবন্ত, আরও দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। ডান হাত তুলে কমরেড লেনিন যেন আসন্ন বিপ্লবের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন এ দেশের কোটি কোটি মুক্তিকামী মেহনতি মানুষকে। লেনিনের প্রতিকৃতির ওপরে একপাশে উজ্জ্বল হলুদে খোদাই করা কাস্তে হাতুড়ি তারা— শ্রমিক শ্রেণির অনিবার্য জয় ঘোষণা করছে। মঞ্চের দুপাশে, ময়দানের মাঝ বরাবর উড়ছে অজস্র লাল পতাকা। মাঠের এক প্রান্তে সুসজ্জিত বুকস্টলে লেনিনের ছবি, লেনিনের ছবি দেওয়া ব্যাজ আর নানা মার্ক্সবাদী বইপত্র। ভিড় উপচে পড়ছে সেখানেও।

বই কিনছিল বছর কুড়ির একটি ছেলে। নাম প্রিয়ব্রত আদক, এসেছে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে। একটি রাজনৈতিক দলের সমাবেশে যোগ দিতে আসার কারণ কী? পড়াশুনার ক্ষতি হয় না? আত্মীয়-বন্ধুরা বারণ করেন না? প্রিয়ব্রত বলল, ‘এখানে আসি জানব, শিখব বলে। এখানে যা পাব, কোনও বইতে সে সব লেখা থাকে না। সাত বছর বয়স থেকে এই দলের কিশোর সংগঠন ‘কমসোমল’ করতাম, এখন ছাত্র সংগঠন করি। যারা বারণ করত, তাদের অনেককে আমি বোঝাতে পেরেছি কেন এখানে আসা দরকার। আজ একা আসিনি, আমার পাঁচ জন বন্ধুকেও নিয়ে এসেছি।’ প্রত্যয়ী শোনায় তাকে।

একই রকম প্রত্যয় ঝরে পড়ে প্রৌঢ় শিবনাথ দে’র গলায়। উত্তর চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুরের বাসিন্দা শিবনাথ বাবু দৃষ্টিহীন, ট্রেনে হকারি করেন। নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা পরোয়া না করে গড়ে তুলেছেন দৃষ্টিহীন হকারদের একটি সংগঠন। একুশের সমাবেশে এসেছেন কেন জানতে চাওয়ায় বললেন, ‘আসতে তো হবেই। এটা আমার দায়িত্ব। লেনিন যা শিখিয়ে গেছেন, সেগুলো আমাদের বারবার জানতে হবে, বুঝতে হবে।’ পাশে দাঁড়ানো বাস কর্মচারী বুদ্ধদেব বাবু হেসে বললেন ঃ ‘শিবনাথ দা’র স্ত্রীও আসেন। আজ আসতে পারেননি।’ এই পথে কি সমাজে বদল আসবে বলে মনে হয়? কথা শেষ করতে দেন না শিবনাথ বাবু। ‘আসবেই, আমি নিশ্চিত। আমি যদি নাও পারি, এই আদর্শ আমার পরবর্তী প্রজন্মকে দিয়ে যাব। বিপ্লব অনিবার্য।’ নীরব সমর্থনে মাথা নাড়েন পাশে দাঁড়ানো আরও দুই দৃষ্টিহীন শিক্ষক। পৃথিবীর রং-রূপ সৌন্দর্য ওঁরা দেখতে পান না, কিন্তু অন্তরের আলোয় চিনে নিয়েছেন এ যুগের মহত্তম মানবমুক্তির আদর্শকে, শরিক হয়েছেন বিপ্লবী সংগ্রামে। কথা হল দার্জিলিং থেকে আসা নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের কয়েকজন ছাত্রের সাথে। ওঁরা রওনা দিয়েছেন আগের দিন রাতে। ট্রেনযাত্রার ধকল, শীতের কষ্ট ছাপ ফেলতে পারেনি চোখেমুখে। সকলেই গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন দলের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য শোনার জন্য। এত দূরের পথ পেরিয়ে লেনিন স্মরণ অনুষ্ঠানে এসেছেন। কিন্তু রোজকার জীবনের যে সমস্যা সেগুলোর কী হবে? চাকরি নেই, খাদ্য নেই এ সবের সমাধান কোথায়? রীতেশ পরিয়ারি, কৌশিক ভৌমিক হেসে বললেন, সেই সমাধানের একমাত্র পথ তো সমাজতন্ত্র, যেটা লেনিন করে দেখিয়েছিলেন। এখানেও কীভাবে তা আনা সম্ভব, সেটাই শুনব আজ। আজকের সমাজকে পাল্টাতে হলে লেনিনকে জানা দরকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশনের ছাত্রী নিবেদিতা মণ্ডলের বাড়ি সুন্দরবনে। মিটিংয়ে এসেছেন এক বান্ধবীর সাথে। বললেন ঃ ‘এখানে এলে বুঝতে পারি, টিভিতে কাগজে সর্বক্ষণ যে ভোটের হিসেব, কাদা ছোড়াছুড়ি দেখি ওটা রাজনীতি নয়। আসল রাজনীতি এটা। আমি আগেও এখানে বই কিনেছি, আজও কিনব। আমার পড়াশুনার বিষয়কে আরও ভালো করে জানার ক্ষেত্রেও সুবিধা হয়।’

একই সুর শোনা গেল হাবড়া থেকে আসা পারমিতা কর্মকারের কথায়। বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখের তরুণী গোটা মাঠ ঘুরে ঘুরে বই বিক্রি করছিলেন। ওঁরা কজন মিলে লেনিন সম্পর্কে কিছু মনীষীর লেখা নিয়ে বের করেছেন একটি সংকলন। বললেন, কলেজ পাশ করে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে নিতে এক শিক্ষকের অনুপ্রেরণাতেই এ পথে এসেছেন, ভালোলাগার টানে। সত্যিই এ রাজনীতিতে মানুষ আসে ভালোলাগার টানেই। পাওনাগণ্ডার হিসাব নয়। সত্যের প্রতি অনুরাগ, ভালোলাগাই এর চালিকাশক্তি।

মঞ্চে তখন ঘোষণা চলছে, মূল সভার কাজ এখনি শুরু হবে, সবাই যেন বসে পড়েন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন গোসাবা থেকে আসা মিছিলটি সভাস্থলে ঢুকছে। কৃষক, শ্রমিক, বৃদ্ধ, মহিলা, যুবক কে নেই সেখানে! একরত্তি সন্তানকে কোলে নিয়েও এসেছেন অনেকে, কেউ বসে আছেন ঘুমন্ত সন্তানকে নিয়ে। কিন্তু কোথাও কোনও বিরক্তি, অসন্তোষ নেই। মঞ্চের সামনের চেয়ার ভরে গেছে, পরে যারা আসছেন কাগজ পেতে বসে পড়ছেন মাঠে। কাগজ না থাকলে ঠান্ডা মাঠেও বসে আছেন শ’য়ে শ’য়ে মানুষ। বুকস্টলের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজের ছাত্র বিক্রম মণ্ডল। বললেন, ‘দেখুন কিছুদিন আগে সিপিএমের সভা হল

আটের পাতায় দেখুন

রাজ্যে রাজ্যে লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ সমাপনী অনুষ্ঠান

গুজরাট ঃ মহান লেনিন মৃত্যুশতবর্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান উদযাপিত হল গুজরাটের সুরাটে, ১৮ জানুয়ারি। সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই (সি)-র গুজরাট রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড মীনাক্ষী যোশী। লেনিনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

কমরেড লেনিনের জীবনসংগ্রাম ও সর্বহারার মুক্তিসংগ্রামে তাঁর অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকানাথ রথ। নভেম্বর বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্যগুলি তুলে ধরেন কমরেড ভাবিক রাজা। সমাপ্তি ভাষণ দেন কমরেড মীনাক্ষী যোশী। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মধ্যপ্রদেশ ঃ লেনিন মৃত্যুশতবার্ষিকী সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ২১ জানুয়ারি একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় (ছবি আটের পাতায়) সভাপতিত্ব করেন দলের গোয়ালিয়র জেলা সম্পাদক কমরেড রচনা অগ্রবাল। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুনীল গোপাল। জনসভায় বিপুল সংখ্যায় বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।

গুজরাট

মহারাষ্ট্রের নাগপুরে সংবিধানচকে ২১ জানুয়ারি লেনিন স্মরণ দিবসের সভায় বক্তব্য রাখছেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রাক্তন সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল

এ বার রামরাজ্য

একের পাতার পর

সেই টাকা ১৫ লক্ষ করে প্রত্যেক নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করে দেবেন। বছরে দু'কোটি করে বেকারকে কাজ দেবেন। বলেছিলেন, দুর্নীতি দূর করে দেশের মানুষকে স্বচ্ছ প্রশাসন দেবেন। সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে আসবে এক 'আচ্ছে দিন'। তালিকায় ছিল এমন আরও অজস্র প্রতিশ্রুতি।

দশ বছরের বিজেপি রাজত্বে মানুষের অভিজ্ঞতা কী? হয়েছে ঠিক উল্টো। জিনিসপত্রের দাম অবিশ্বাস্য হারে বেড়েছে। গৃহস্থের যে গ্যাসের দাম সেই সময়ে ছিল সাড়ে চারশো টাকা, তা বেড়ে এখন হয়েছে প্রায় এক হাজার টাকা। ডিজেল-পেট্রোল কিংবা ভোজ্য তেলের দাম হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ক্রমশ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। একটি কালো টাকাও বিদেশ থেকে ফেরেনি শুধু নয়, কালো টাকার মালিকদের তালিকাটুকু প্রকাশ্যে আনতেও রাজি হয়নি এই বিজেপি সরকার। কর্মহীনতা গত পঞ্চাশ বছরে রেকর্ড। লক্ষ লক্ষ চাষি আত্মহত্যা করছে। তিনটি কৃষক স্বার্থ ধ্বংসকারী কৃষি আইন নিয়ে এসেছিল এই সরকার, যা প্রবল কৃষক বিদ্রোহের মুখে বাধ্য হয়ে প্রত্যাহার করতে হয়েছে তাদের। নির্যাতিতা, ধর্ষিতা নারীর আর্তনাদে দেশের বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। ধনকুবেরদের সম্পদ বেড়েছে অবিশ্বাস্য হারে। শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম মজুরিটুকুর ভরসাও সরকার দেয়নি, বরং শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী কালা আইন চালু করেছে। লাখ লাখ শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ ক্রমাগত দারিদ্রের গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক অক্সফ্যাম রিপোর্ট দেখাচ্ছে, দেশের ৩ শতাংশ সর্বোচ্চ ধনীর হাতে কুক্ষিগত হয়েছে দেশের মোট সম্পদের ৪০ শতাংশ, যেখানে সবচেয়ে নিচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে মাত্র ৩ শতাংশ সম্পদ। গত ৩০ বছরে ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য মারাত্মক আকারে বেড়েছে। মোদি শাসনে তা আরও তীব্র রূপ নিয়েছে। ২০২০ সালে যে শতকোটিপতির সংখ্যা ছিল ১০২ জন, তা ২০২২ সালে পৌঁছেছে ১৬৬-তে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাপক বেসরকারিকরণ। ধনকুবেরদের হাতে তেল, রেল, গ্যাস, ব্যাঙ্ক, বিমা, বন্দর, খনি সহ দেশের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ এবং সম্পত্তি জলের দরে তুলে দিচ্ছে মোদি সরকার। এ ক্ষেত্রে এমনকি প্রশাসনিক কিংবা আইনি কোনও প্রক্রিয়ারই ধার ধারছেন না প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়েই শিল্পপতি হিসাবে গৌতম আদানির উত্থান হয়েছে এবং আর মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বে সেই উত্থান এগিয়েছে উল্কার গতিতে। সরকারি ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এইভাবে বিশেষ কিছু পুঁজিপতিকে সুবিধে পাইয়ে দেওয়া, বিনিময়ে তাঁদের অঢেল আশীর্বাদ লাভ করা এবং গদি অটুট রাখা, রাজনীতির পরিভাষায় যাকে বলে স্যাঙাৎতন্ত্র, তারই রমরমা চলছে মোদি শাসনে।

এই হল মোদি রাজত্বের নমুনা। তাই কোন রামরাজত্ব এবং কাদের জন্য রামরাজত্ব তিনি আসলে কায়েম করবেন তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যে মুনাফাসর্বস্ব পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে নিংড়ে সর্বস্বান্ত করছে, তাকেই আরও সংহত, ও শক্তিশালী করার কাজ নরেন্দ্র মোদি দশ বছর ধরে করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। কাজেই, এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পর দেশের মানুষের রুজিরুটির সমস্যার কোনও সুরাহা হবে বা দেশে হিংসা-বিদ্বেষ-ধর্মীয় হানাহানি কমবে, এমন দুরাশা কেউ করে না।

তা হলে প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ রামরাজত্বের কথা বললেন কেন? আসলে প্রতারণার রাজনীতির রূপই এমন। একটা প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গেলে আবার একটা নতুন প্রতিশ্রুতি আনতে হয়। আবার সেটা ধরা পড়ে গেলে নতুন আর একটা। গত দশ বছরে জীবন-যন্ত্রণা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে জনগণের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সেই ক্ষোভ যে কোনও সময়ে প্রবল বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়তে পারে। অভূতপূর্ব এই সঙ্কটের থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতেই প্রধানমন্ত্রীর রামমন্দির উদ্বোধন এবং রামরাজত্বের স্লোগান তোলা। বাস্তবে আচ্ছে দিন এবং অমৃতকালের পর 'রামরাজত্ব' এ বার আর এক নতুন ভাঁওতা। দেশের বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষের মনে ধর্মের প্রতি, মহাকাব্যের চরিত্র হিসেবে রামের বীরগাথার প্রতি যে স্বাভাবিক আবেগ রয়েছে তাকেই কাজে লাগাতে প্রধানমন্ত্রীর দল রামমন্দিরের জিগির তুলেছিল তিন দশক আগে। 'রামের মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছিল' এমন অভিযোগ তুলে পাঁচশো বছর আগের একটি বিষয়কে টেনে এনে হিন্দু ভাবাবেগকে খুঁচিয়ে তুলেছেন তাঁরা। অথচ যে সময় বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছিল তখন রামচরিত মানসের রচয়িতা তুলসীদাস জীবিত। তিনি রামের জন্মস্থানের ওপর কোনও মন্দির আছে অথবা তা ভাঙ হয়েছে এমন কথা কোথাও লেখেননি। সমসাময়িক কোনও ঐতিহাসিক উপাদানেও তা নেই। বিবেকানন্দের মতো হিন্দু ধর্মের প্রবক্তাও বলছেন, কৃষ্ণ বা রাম পৌরাণিক না ঐতিহাসিক চরিত্র তা নিয়ে বিতর্ক না করে রামায়ণের থেকে যা শিক্ষা নেওয়ার তা নিতে হবে। চৈতন্যদেব থেকে শুরু করে হিন্দু ধর্মের কোনও বড় মানুষই রামমন্দির ভেঙে মসজিদ হয়েছিল— তা বলেননি।

তাছাড়া গণতান্ত্রিক একটি শাসন ব্যবস্থায় কখনও পাঁচশো বছরের পুরনো কোনও ঘটনা সম্পর্কে বিতর্ককে টেনে এনে তাকে রাজনীতির বিষয় করে তোলা যায় না। তা যদি হয় তাহলে এর কোনও শেষ থাকে না। গোটা ব্রিটিশ শাসন জুড়ে ভারত থেকে যে বিপুল সম্পদ লুঠ করে নিয়ে গেছে ব্রিটিশরা, কই বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা তো ব্রিটিশ সরকারকে সে সব ফেরত দিতে হবে বলে দাবি করছেন না!

ব্রিটিশ শাসনে যে অজস্র ভারতবাসীর উপর ব্রিটিশরা অত্যাচার চালিয়েছিল, দেশের মানুষকে অন্যায় ভাবে হত্যা করেছিল, কই তার বিচার তো তাঁরা চাইছেন না বা বলছেন না যে, আজ ভারতের শক্তি বেড়েছে, ফলে আমরা তার প্রতিশোধ নেব। বাস্তবে এটা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে পড়ে না।

দেশের মানুষ যদি আজ বিজেপি নেতাদের দিকে আঙুল তুলে বলে, তোমাদের নেতারা আজ নতুন জাতি গঠনের কথা বলছেন, অথচ যে দিন সত্যিই জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশপ্রেমের ভিত্তিতে নতুন জাতি গড়ে উঠছিল, সেই গৌরবময় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিজেপি-আরএসএস এর পূর্বসূরী নেতারা কেউ সেই আন্দোলনে যোগ দেননি তাই শুধু নয়, বরং ব্রিটিশের হয়ে দালালি করেছেন, তাই আপনাদের কোনও অধিকার নেই স্বাধীন ভারতের শাসন ক্ষমতায় বসার, বিজেপি নেতারা কি তা মেনে নেবেন? সরসঙ্ঘ গুরু গোলওয়ালকরের লেখায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নানা কীর্তিতে, সাভারকরের মুচলেকায় সেই নির্লজ্জ ব্রিটিশ স্তাবকতার ইতিহাস ধরা আছে। বাস্তবে ব্রিটিশের দাসত্ব করার সেই কলঙ্কজনক ইতিহাসকে ঢাকতেই আজ 'নতুন জাতি'-র তত্ত্ব আওড়াতে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে।

প্রধানমন্ত্রী রামমন্দির প্রতিষ্ঠাকে বলেছেন— দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্তি। বাস্তবে এই দাসত্ব মুক্তির বুলি দিয়ে তিনি আড়াল করতে চাইছেন তাঁদের পুঁজির দাসত্বকে। দেশের কোটি কোটি মানুষের পরিশ্রমের ফসল মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের হাতে তুলে দেওয়া এবং বিনিময়ে তাঁদের আশীর্বাদ লাভ করে ক্ষমতার গদিতে বসা এবং তাকে টিকিয়ে রাখাটা কি দাসত্বের মনোভাব নয়? এই মন্দির প্রতিষ্ঠার দ্বারা কি সেই দাসত্ব থেকে বেরোনো যাবে? বাস্তবে, এই রামমন্দির কাণ্ডের দ্বারা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতোই আর একটি কলঙ্কজনক দিন তৈরি হল দেশের ইতিহাসে। শত সহস্র মানুষের সংগ্রামের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে অনেক ত্রুটি নিয়েও যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি, সংবিধান নির্ধারিত শাসন ব্যবস্থাটি ভারতে কায়েম হয়েছিল, আজ রামরাজত্ব স্থাপনের নাম করে সেই গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হিন্দু মৌলবাদ ভিত্তিক এক স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে দেশকে নিয়ে চলেছেন তাঁরা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার যে প্রাথমিক শর্ত— রাষ্ট্র ধর্মের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে, ধর্ম হবে প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত বিষয়, নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মাচরণের অথবা ধর্ম না মানারও অধিকার প্রতিটি নাগরিকের থাকবে— সেই শর্তটিকেই আজ প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দলবল দু-পায়ে মাড়াচ্ছেন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার কথা তাঁরাই সব চেয়ে উঁচু স্বরে ঘোষণা করেন, রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সেই বিচার ব্যবস্থাকেও তাঁরা গণতন্ত্র হত্যার এই কাজে শামিল করেছেন। ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে প্রশাসনকে একাকার করে দিয়েছেন, মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে খুলে দিয়েছেন। এই সব কিছুই সরকারের গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এই ভাবে তাঁরা শ্রমিক-কৃষক সহ সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, প্রতিবাদ করার অধিকার, সংগঠন গড়ার অধিকার, আন্দোলন করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন, প্রতিবাদ করলেই চলছে অমানুষিক দমনপীড়ন। এইভাবে দেশে তাঁরা এক স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করছেন। এ সব কিছুই আসলে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চাকরির সমস্যা থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়া, দেশের মাটিতে গণতান্ত্রিক চেতনার অবশেষটুকুকেও হত্যা করে পুঁজির শাসনকে অবাধ করার চেষ্টা।

ভোটে জেতার তাগিদে প্রধানমন্ত্রী যতই বক্তৃতার ফুলঝুরি ছোটান, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা আর শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের জীবনের উন্নতি— এই দুটো যে একসাথে করা যায় না, এই কথাটা মানুষকে স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। এ কথাও মনে রাখা দরকার রামরাজত্ব বা স্বর্গরাজ্য যাই হোক না কেন, তার সাথে যদি সাধারণ মানুষের সুস্থ সুন্দর জীবনের কোনও সম্পর্ক না থাকে, তবে মন্দির-মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে তা আনা সম্ভব নয়। একমাত্র সম্ভব শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের মাধ্যমে, সমাজতন্ত্র কায়েমের মধ্য দিয়ে। মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস বলেছিলেন, যুগে যুগে মহান মানুষেরা নিপীড়িত অসহায় মানুষের মুক্তির কথা ভেবেছেন, কিন্তু তার যথার্থ পথ দেখাতে না পেরে তাঁরা সবাই মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে মুক্তির কল্পনা করেছেন। মার্ক্সবাদই প্রথম সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সেই স্বর্গকে এই মাটির পৃথিবীতেই সম্ভব করে তুলেছে। আজ শোষণমুক্ত সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে শ্রমজীবী মানুষকে মার্ক্সবাদ নির্দেশিত পথে সেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই সংগ্রাম জোরদার করতে হবে।

পাঠকের মতামত

মানুষ চায় না, তবু কেন যুদ্ধ হয়

সমাজতান্ত্রিক নভেম্বর বিপ্লব হওয়ার পর পরই সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তির লেনিনবাদী কর্মনীতি অনুসরণ করে আগ্রাসী যুদ্ধ নিবারণ, সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ এবং রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি রূপায়িত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছে। পুঁজিবাদী বিশ্ব যদি সে কথায় কর্ণপাত করত তা হলে হয়তো পৃথিবীর এক জটিল সমস্যার চিরতরে নিরসন হয়ে যেত।

দীর্ঘদিন ধরে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধ। ইজরায়েল যেভাবে হামলা চালাচ্ছে তা গণহত্যা ছাড়া কিছু নয়। আন্তর্জাতিক আইন অগ্রাহ্য করে গাজায় স্কুল, হাসপাতাল এমনকি ত্রাণসামগ্রীর গুদামেও বোমা ফেলছে ইজরায়েল।

এই যুদ্ধে যে বিপুল অর্থ ও প্রাণশক্তির অপচয় হচ্ছে তার সঠিক হিসাব কোনও দিনই পাওয়া যাবে না। যুদ্ধবাজ দেশগুলো শত্রু দেশকেই শুধু ধ্বংস করে তাই নয়, যুদ্ধের ফলে তার নিজের দেশের মানুষও খাদ্য-শিক্ষা-চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই কোনও সাধারণ মানুষই যুদ্ধ চায় না। অথচ একের পর এক যুদ্ধ হয়ে চলেছে।

মহান লেনিন দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদ যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন কেন ও কী ভাবে যুদ্ধের সম্ভাবনাও টিকে থাকবে। দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে যুদ্ধ আসলে একটা ব্যবসা। শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণে গোটা বিশ্বের খেটে-খাওয়া মানুষ আজ নিঃস্ব। তাদের কেনাকাটা করার ক্ষমতা ক্রমে কমে আসছে। শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিজস্ব নিয়মেই বিশ্ব জুড়ে আজ উৎপাদিত পণ্যের বিক্রির বাজারে ভয়ঙ্কর মন্দা। এই অবস্থায় নিজে যুদ্ধ বাধিয়ে এবং অন্য দেশগুলিকে যুদ্ধে উস্কানি দিয়ে অস্ত্র ব্যবসার রাস্তা খুলে দেওয়া ছাড়া পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির নিজেদের টিকিয়ে রাখার অন্য উপায় নেই।

তাই, প্রার্থনা-শুভকামনা অথবা পূজা-আর্চা করে এই যুদ্ধ-রোগ প্রতিরোধ করা যাবে না। যুদ্ধের জন্মদেওয়া মুনাফাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে মানুষের প্রয়োজনভিত্তিক সমাজের প্রতিষ্ঠা না হলে পৃথিবীর বুক থেকে যুদ্ধের বিভীষিকা দূর করা যাবে না।

সুশান্ত সাহু
সেকপুরা, পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি সংগ্রাম, সমাজতন্ত্রের সমগ্র সংগ্রামের সঙ্গেই নারীর মুক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা, রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ পূর্তি হল এ বছর ২১ জানুয়ারি। এই মহান মানুষটির নেতৃত্বেই ১৯১৭ সালের নভেম্বরে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার বুকে জন্ম নিয়েছিল বিশ্বের প্রথম শোষণহীন রাষ্ট্র। শত শত বছর ধরে লাঞ্ছিত-নিপীড়িত মানুষ শোষণমুক্তির যে স্বপ্ন দেখেছে, যে স্বপ্ন দেখেছেন নিপীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনে ব্যথিত দরদি মনের মহৎপ্রাণ মানুষেরা, তাদের সকলের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দিয়েছিল এই বিপ্লব। 'স্বর্গ' বা 'পরলোক' নয় এই মর্ত্য পৃথিবীতেই যে শোষণ-বঞ্চনামুক্ত এক আদর্শ মানবসমাজ গড়ে তোলা সম্ভব, তার সজীব নিদর্শন তুলে ধরেছিলেন মহান লেনিন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সমাজবিজ্ঞানের সর্বোন্নত দর্শন মার্ক্সবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে হাতিয়ার করে মহান মার্ক্সের সুযোগ্য উত্তরসূরী কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি এই বিপ্লবকে সফল করেছিল— যার মধ্যে দিয়ে রাশিয়ায় যুগ-যুগান্তের ক্ষুধা, ব্যাধি, দারিদ্র, অভাব, বেকারি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতা দূর করা সম্ভব হয়েছিল। শত শত বছরের পশ্চাৎপদতাকে ঠেলে সরিয়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতির চরম শিখরে। চিরকালের লাঞ্ছিত নারী পেয়েছিল আত্মবিকাশের পথ, পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদায় সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই উন্নতি ছিল মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা।

বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অধীনে মধ্যযুগীয় পশ্চাৎপদতা, সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ছিল দেশ জুড়ে। ১৮ শতকের শেষ ভাগ থেকে ১৯ শতকের শেষার্ধ এই ১০০ বছরে রাশিয়া ৫১টি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখেছিল। খিদে ছিল মানুষের নিত্যসঙ্গী। এর উপর লেগে থাকত যুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দেশের কৃষক ও শ্রমিক পরিবারগুলির বড় অংশের পুরুষকে যুদ্ধে সৈনিক হতে হয়েছিল। ফলে সংসারের সব কাজই সামলাতে হত মেয়েদের। অপরদিকে পেট্রোগ্রাড, মস্কো প্রভৃতি পশ্চিমের শহরগুলিতে গড়ে ওঠা শিল্প কলকারখানাগুলিতে গ্রামের মানুষ কাজের জন্য দলে দলে ভিড় করতে লাগল। বাসস্থানের অভাব, খিদে ও ঠাণ্ডার সাথে লড়াই করে তাদের জীবন কাটত। পুরুষ শ্রমিকরা ১০-১২ ঘন্টা করে কারখানার হাড়ভাঙা খাটুনির পর মদ ও ফুর্তির আসরে টাকা উড়িয়ে অবসন্ন শরীরে বাড়ি ফিরে প্রভুত্ব করত স্ত্রীদের উপর। প্রতিবাদ করলে জুটত মার। ছেলে-মেয়েদের খিদের যন্ত্রণা আর কান্না ছিল নিত্যসঙ্গী। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' উপন্যাসে আমরা এর বর্ণনা পাই। সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দিতে মেয়েরাও বিভিন্ন কারখানায় কাজে যোগ দিতে লাগল। কারখানাগুলিতে নারী শ্রমিক নিয়োগ করা হত অত্যন্ত মজুরিতে। সারাদিনের খাটুনির পর বাড়িতে স্বামীর আধিপত্য ও অত্যাচার সহ্য করতে তারা বাধ্য ছিল। দুশ্চরিত্র স্বামীকে ত্যাগ করার অধিকারও নারীদের ছিল না। সামন্তী সংস্কৃতির নিগড়ে বাঁধা জীবনে পুরুষই ছিল পরিবারের হর্তাকর্তা। নারীরা বাস্তবে ছিল পুরুষদের সম্পত্তি। হুকুম তামিল করা, রান্নাবান্না, বাচ্চা দেখভাল, ঘর-গেরস্থালির কাজ থেকে চাষের কাজ সবই করতে হত মহিলাদের। কিন্তু ছিল না কোনও ভোট দেওয়ার অধিকার। এমনকি কোনও নারীর নামে পাসপোর্ট পর্যন্ত দেওয়া হত না। অধিকাংশ নারী ছিল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। পতিতাবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হত বহু নারী।

মহান লেনিন দেখিয়েছেন, নারীদের এই সকল শোষণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি এবং প্রকৃত স্বাধীনতা কেবলমাত্র সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মারফতই আসতে পারে। তিনি বলেছেন, উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে নারীদের সামাজিক ও মানবিক অবস্থার যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সে কথা দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে হবেই। তার থেকেই আমাদের নীতি আর নারীবাদ (ফেমিনিজম)-এর মধ্যে স্পষ্ট ও মৌলিক পার্থক্য বোঝা যাবে। এইগুলোই নারীদের প্রশ্নকে সামাজিক প্রশ্ন ও শ্রমিক সমস্যার অংশ হিসেবে বুঝবার ভিত্তি জোগাবে। লেনিন তাঁর বিপ্লবী কর্মজীবনে শ্রমিক ও কৃষক রমণীদের মুক্তির বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। এসবের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন শ্রমিক শ্রেণির মুক্তিসংগ্রাম, সমাজতন্ত্রের সমগ্র সংগ্রামের সঙ্গেই নারীর মুক্তি অবিচ্ছেদভাবে জড়িত।

বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের একেবারে শুরুতেই কমরেড লেনিন নারী-শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য লড়াই এবং শ্রমিক আন্দোলনে নারীদের টেনে আনার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। পিটার্সবার্গে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রচুর 'বেআইনি' প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। এগুলো গোপনে শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হত। 'লাফার্ম' সিগারেট কারখানার নারী-শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে তিনি দুটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৯৫ সালে থর্নটন কাপড় কলের শ্রমিকদের প্রচারপত্রের শিরোনামে লেখেন— 'থর্নটন কলের নারী-পুরুষ শ্রমিকদের প্রতি'। এটা একটা ছোট্ট ঘটনা কিন্তু খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক। নির্বাসনে থাকার সময় অনেক প্রবন্ধে তিনি নারী শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণনা করেন। কারাবাসে থাকাকালীন শ্রমিক কৃষকদের তৎকালীন অবস্থা, একই সাথে নারী শ্রমিকদের দুর্দশা বিষয়ে তিনি অনুসন্ধান করেন এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও রিপোর্টের ভিত্তিতে অত্যন্ত খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৬ থেকে ১৮৯৯ সাল জুড়ে ডেভেলপমেন্ট অফ ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া লিখতে গিয়ে লেনিন বারবার বিশ্লেষণ করেছেন রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণির দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যেও মহিলাদের উপর শোষণের দ্বিগুণ মাত্রার কথা। এই গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করেছেন কীভাবে পারিবারিক উৎপাদন ও ছোট ছোট উৎপাদনের কাজে আটকে থেকে মেয়েরা শোষিত হয়। কীভাবে বৃহৎ শিল্প কলকারখানার কাজের প্রভাবে নারী শ্রমিকদের দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে, সংগ্রামে শিক্ষিত হয়ে উঠছেন তাঁরা। তার ফলে পরনির্ভরতা কমে যাচ্ছে, পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের বাঁধন খসে পড়ছে। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁদের আরও সরাসরি সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকায় পুরুষতন্ত্রের সম্পর্কগুলি ছাপিয়ে গিয়ে সমাজের পরিসরে একজন স্বতন্ত্র শ্রমিক হিসেবে নিজের জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছেন শ্রমিক শ্রেণির মহিলারা। তিনি আরও দেখান— শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের উদ্দেশ্য শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক সমান অধিকার নয়। এর প্রধান কাজ সামাজিক উৎপাদনের কাজের মধ্যে নারীদের টেনে আনা, তাদের 'পারিবারিক দাসত্ব' থেকে উদ্ধার করা।

তিনি নারীদের তুচ্ছ ঘরকন্নার কাজ থেকে মুক্ত করে বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন— বুর্জোয়া গণতন্ত্র শুধু মুখেই সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়। কাজের বেলায় একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশ, এমনকি সবচেয়ে উন্নত দেশও মানবজাতির অর্ধেক যে নারীসমাজ, তাদের আইনত পুরুষের সমান অধিকার অথবা পুরুষদের শাসন ও দমন থেকে মুক্তি দেয়নি। বুর্জোয়া গণতন্ত্র শুধু জাঁকালো গালভরা কথার বড় বড় প্রতিশ্রুতির আর স্বাধীনতা ও সাম্যের নামে আড়ম্বর ভরা ধ্বনির গণতন্ত্র। কিন্তু কাজের বেলায় এই গণতন্ত্র নারীদের স্বাধীনতাহীনতা ও নিকৃষ্ট অবস্থা, একই সাথে সমস্ত শোষিত শ্রমিকের স্বাধীনতাহীনতা ও নিকৃষ্ট অবস্থাকে চাপা দিয়ে রাখে।

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি মহিলা শ্রমিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানোর কাজে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছেন। যার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির মহিলারা বুঝেছিলেন জারতন্ত্রের ভয়ঙ্কর নীতিগুলোর জন্যই দারিদ্র্য ও অধীনতায় জরাজীর্ণ অসহায় জীবন তাদের। উনিশ শতকের শেষ দশকে মার্ক্সীয় পাঠচক্রে যোগদান করতে থাকেন একের পর এক মহিলা। মার্ক্সীয় দর্শনের চর্চা, আগামী দিনের বিপ্লবের রূপরেখা বিষয়ে গভীর তত্ত্বগত আলোচনাতেও অংশ নিতে থাকেন মহিলা সংগঠকরা। তাঁরা মূলত কলে-কারখানায় ছড়িয়ে গিয়ে মহিলা শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ করতেন। এই কাজ বিস্তার লাভ করেছিল মহিলা দর্জি, গৃহপরিচারিকা, গ্রামাঞ্চলের খেতমজুর মহিলাদের মধ্যে। বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বে এরকম বহু দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন মহিলা সংগঠকরা। শহরের বস্ত্র ও অন্যান্য হালকা শিল্পে যেখানে মহিলা শ্রমিকরা বেশি কাজ করতেন, সেখানে বলশেভিক মহিলা সংগঠকরা মতাদর্শগত প্রচার করতেন। এর ফলে হাজার হাজার নারী শ্রমিক নভেম্বর বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

নভেম্বর বিপ্লবের পরপরই কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ নেয়। নির্বাচনে, সম্পত্তিতে, শিক্ষায় ও চাকরিতে নারীদের কোনও শর্ত ছাড়া সমান অধিকার প্রদান করা হয়। নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই ন্যূনতম মজুরি ও আট ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ করা হয়। নারীদের সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে, রান্নাঘর ও আঁতুড় ঘরের বোঝা দূর করতে যৌথ রান্নাঘর, লন্ড্রি, শিশুদের জন্য কিন্ডারগার্টেন করা হয়। পুরো বেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি প্রসূতি মায়েদের জন্য পার্ট টাইম চাকরি এমনকি কর্মক্ষেত্র থেকে তিন ঘন্টা পর পর শিশুকে মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানোর জন্য ছুটি দেওয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কীভাবে নারীমুক্তির পথ উন্মুক্ত করেছে তার বাস্তব প্রমাণ উল্লেখ করে ১৯১৮-তে লেনিন বলেন, নারীদের অবস্থার কথা ধরা যাক। ক্ষমতা হাতে পাবার প্রথম বছরই আমরা এ বিষয়ে যতখানি করেছি পৃথিবীতে এমন একটাও গণতান্ত্রিক দেশ নেই যে বছরের পর বছর ধরে তার শতাংশের এক অংশ করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি সবচেয়ে উন্নত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশও নয়। এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে, যেসব আইন পুরুষদের কাছে নারীকে হেয় করে রেখেছিল, বিবাহ বিচ্ছেদের যেসব বাধা নিষেধ ও বিরক্তিকর পদ্ধতি ছিল, তথাকথিত অবৈধ সন্তানদের সম্বন্ধে ও তাদের পিতাদের অনুসন্ধান করে বেড়ানো প্রভৃতি বিষয়ে যেসব জঘন্য আইন ছিল আমরা তার লেশমাত্র চিহ্ন অবশিষ্ট রাখিনি। এ বিষয়ে আমরা যা করেছি তার জন্য হাজার বার গর্বিত হওয়ার অধিকার আমাদের আছে।

বিপ্লব পরবর্তী সোভিয়েত সরকার অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ধাপে ধাপে দেশ থেকে পতিতাবৃত্তি নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিল। পতিতা নারীদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনে মর্যাদার সাথে বাঁচার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সকল শিশুর দায়িত্ব রাষ্ট্র নিয়েছিল। ফলে সে দেশে আমাদের দেশের মতো রাস্তায়, ফুটপাতে, রেলস্টেশনে, চায়ের দোকানে অন্নহীন, শিক্ষাহীন অসহায় পথশিশুর চিহ্ন ছিল না। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে সর্বদিক দিয়ে এক নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, খেলাধূলা সমস্ত ক্ষেত্রে সে দেশের নারীরা পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিল।

মহান লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষে নারীমুক্তিকে বাস্তবায়িত করার পথপ্রদর্শনে তাঁর অবদানের কথা প্রতিটি দেশের শোষিত লাঞ্ছনাবিদ্ধ নারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আজ একান্ত প্রয়োজন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

মিড ডে মিল কর্মীদের যুক্ত মিছিল

কলকাতা। ২৯ জানুয়ারি। (সংবাদ প্রথম পাতায়)

ভরসা সংগ্রামী বামপন্থা

বইমেলায় সেই বই খুঁজেছেন মানুষ

একদল বুদ্ধিজীবী দেখাতে চান রাজনীতি ব্যাপারটাতেই যেন মানুষের অনীহা। বিশেষত বামপন্থী রাজনীতি, মার্ক্সবাদ এ সবের প্রতি যেন বর্তমান প্রজন্মের আকর্ষণ নেই। অথচ এবারের কলকাতা বইমেলায় গণদাবী স্টলে দেখা গেল ইউ সি আই (সি)-র সংগ্রামী বামপন্থার লাইন এই সময়ে বিশেষ ভাবে চোখে পড়ছে নবীন প্রজন্ম ও বামমনস্ক মানুষদের। তাঁরা এ বার স্টল থেকে কিনেছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের 'কেন ভারতের মাটিতে এস ইউ সি আই (সি) একমাত্র সাম্যবাদী

বইমেলায় গণদাবী স্টল। ২৭ জানুয়ারি ২০২৪

সম্পূর্ণ অন্য চিত্র। প্রথম সপ্তাহেই কয়েক লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

স্টলে সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত, মার্ক্সবাদী অথরিটি ও বর্তমান সময়ের নানা বিশ্লেষণমূলক বই ছাড়া অন্য কোনও বই বিক্রি হয় না, তবুও এত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে কী ভাবে? স্টলের কর্মীদের একজন বললেন, বর্তমান সমাজের সঙ্কট চিন্তাশীল মানুষকে খুবই ভাবাচ্ছে। তাঁরা এই সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ খুঁজছেন। মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বলেছেন, বাস্তবে জ্ঞান জগতকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করেছে শোষিত সম্প্রদায়। সত্য জানার প্রয়োজন তাদেরই সবচেয়ে বেশি।

দেশ জুড়ে চলছে আদর্শগত দেউলিয়া রাজনীতির রমরমা। সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেসের ধারাবাহিকতায় বিজেপির জনবিরোধী শাসন মানুষ দেখছে। এ রাজ্যে পরিবর্তন আনার যে প্রতিশ্রুতি তৃণমূল দিয়েছিল, ক্ষমতায় বসেই তারা তা ভুলে বসেছে। সিপিএমের ৩৪ বছরের অবাম শাসন মানুষ আজও ভুলতে পারেনি। এখন যে কোনও উপায়ে একটা-দুটো এমএলএ-এমপি পাওয়ার লোভে তাদের কার্যকলাপ বামমনস্ক মানুষকে ব্যথা দিচ্ছে। এই অবস্থায় পথ কী? রাজনৈতিক দিশা কী? উত্তর পেতে গণদাবী স্টলে আসছেন অনেকেই। এস দল', 'মার্ক্সবাদ ও মানবসমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে', 'বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়', 'ফ্যাসিবাদ ও বামগণতান্ত্রিক আন্দোলনে নৈতিকতার সঙ্কট', 'নির্বাচন সর্বস্ব রাজনীতি নয়, বিপ্লবী আন্দোলনই মুক্তির পথ' প্রভৃতি বইগুলি। লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' এবং কমরেড প্রভাস ঘোষের 'মার্ক্সবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব', 'মহান নভেম্বর বিপ্লব ও লেনিন', 'মহান স্ট্যালিন ও কমিউনিজম বিরোধী অপপ্রচারের জবাবে' ইত্যাদি বইগুলির প্রতি আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ধর্মীয় উগ্রতা ও তা প্রসারের লক্ষ্যে শাসকদলের নির্লজ্জ ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মানুষ 'উগ্র জাতীয়তাবাদ, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদের বিপদ প্রসঙ্গে', 'ধর্মীয় চিন্তা, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা এবং মার্ক্সবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' বইগুলি সংগ্রহ করেছেন। সংগ্রহ করছেন 'ভারতে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণে সিপিএম, সিপিআই ও নকশালপন্থীদের সাথে এস ইউ সি আই (সি)-র পার্থক্য কোথায় ও কেন' ইত্যাদি বই। নবজাগরণের মনীষীদের জীবনসংগ্রাম যথার্থ ভাবে জানতে তাঁরা কিনেছেন 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ একটি মূল্যায়ন' ও 'শহিদ-ঈ-আজম ভগৎ সিং একটি মার্ক্সবাদী মূল্যায়ন' বইগুলি।

লেনিন স্মরণ সমাবেশে

পাঁচের পাতার পর

ব্রিগেডে, আমি সেই বক্তৃতাও শুনেছি। তৃণমূল দুর্নীতি করছে, ওদের সরিয়ে আমাদের ক্ষমতায় আনো এই ছিল ওদের বক্তব্য। আর এই সমাবেশে শুনছি মার্ক্সবাদের কথা, বিপ্লবের কথা, সমাজতন্ত্রের কথা। এ জিনিস আজ অন্য কোনও দলে নেই।'

সত্যিই এ এক অন্যরকম সমাবেশ, যেখানে ভোটের কচকচি নেই, ক্ষমতার আস্ফালন নেই, অন্য দলের বিরুদ্ধে রুচিহীন কুৎসা নেই। আছে বিপ্লবের আহ্বান, মহৎ আদর্শকে বরণ করার ডাক। আছে আদর্শগত চর্চা, নিজেদের জীবনে মার্ক্সবাদের প্রয়োগ। আকাশ-বাতাস মুখরিত করে ওঠা স্লোগানেও ছিল সেই অন্য সংস্কৃতির ছাপ— নিছক সরকার বদলের লড়াই নয়, সমাজ বদলের লড়াই চাই। মন্দির-মসজিদ নয়, ভুখা মানুষের খাদ্য চাই। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করো।

মহান লেনিন এই মাটির পৃথিবীর বুকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া নামে এক বাস্তবের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গোটা বিশ্ব দেখেছিল, মার্ক্সবাদ কোনও পুঁথিতে আবদ্ধ দর্শন নয়, বাস্তবের মাটিতে একে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে এমন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব, যেখানে একদল মানুষের শ্রম নিংড়ে কিছু মানুষ মুনাফা করতে পারবে না।

যে সমাজ দারিদ্র বেকারি অসাম্য থেকে মুক্ত হবে, যেখানে মানুষের জীবন হবে সুস্থ, সুন্দর। আর এটা করতে গিয়ে মার্ক্সবাদকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করার সাথে সাথে লেনিন একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য অমূল্য পথনির্দেশ দিয়েছিলেন। লেনিনের দেখানো সেই পদ্ধতি এবং

লেনিন স্মরণে সভা। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র। ২১ জানুয়ারি

সংগ্রাম অনুসরণ করে ভারতের বুকে একটি যথার্থ কমিউনিস্ট দল গড়ে তোলার কাজটি করেছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ।

তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, এ দেশে অনেক বড় বড় কমিউনিস্ট নামধারী পার্টি থাকলেও সেগুলো সঠিক লেনিনীয় পদ্ধতি মেনে মতবাদিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেনি, ভারতের বিশেষ রাজনৈতিক-আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদকে বিশেষীকৃত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং দলের ভেতরেও চিন্তার ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আদর্শগত কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণ করেনি। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় গড়ে ওঠা এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) জন্মলগ্ন থেকেই এগিয়েছে এই কঠিন সংগ্রামের পথ ধরে। এ এক আলাদা জাতের দল, যে দলকে মানুষ চেনে এমএলএ-এমপি'র সংখ্যা দিয়ে নয়, চেনে গণআন্দোলনের শক্তি হিসেবে। এ দিনের সমাবেশ আবারও প্রমাণ করল, সংগ্রামী বামপন্থার পতাকা নিয়ে মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে বুকে নিয়ে এ দল এগোচ্ছে। তাই আর পাঁচটা দল যখন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে নীতিহীন জোটের খেলায় মেতেছে, চুরি-দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে মানুষের রুজিরুটি নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, দেশের কোটি কোটি মানুষকে অভুক্ত রেখে ধর্মের নামে নোংরা রাজনীতি চলছে, তখন ভারতের বুকে এই একটি মাত্র দল ২১ জানুয়ারি স্মরণ করল সোভিয়েত বিপ্লবের কাণ্ডারি, বিশ্বের শোষিত মানুষের নেতা মহান লেনিনকে।

প্রবল শীত উপেক্ষা করে লাখো মানুষ জড়ো হল শহিদ মিনার ময়দানে, গভীর মনোযোগে শুনল লেনিনের কথা, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ব্যাপক অগ্রগতির কথা, শপথ নিল আগামী সংগ্রামের। যে কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে একুশের প্রচার করেছেন, যারা প্রতিটি গানকে নিখুঁত করার জন্য মহড়া দিয়েছেন দিনের পর দিন, সুদূর গ্রাম থেকে যে কৃষক এসেছেন তার পরিবার নিয়ে, যে স্বেচ্ছাসেবকের দল রাত জেগে সাজিয়েছেন মঞ্চ আর মাঠ, যে রমণী বাড়ির কাজ ফেলে ছুটে এসেছেন সন্তান কোলে নিয়ে, তাদের প্রত্যেকের চোখেমুখে খেলা করছিল সেই শপথের আলো, আদর্শের প্রত্যয়, স্রোতে গা না ভাসিয়ে এক মর্যাদাময় জীবনের শরিক হতে পারার আনন্দ।

সভার শেষে মাঠ ছাড়ছে ঘরমুখী জনস্রোত। তখনও প্রবল ভিড় বুকস্টলে, মাঠ জুড়ে স্বেচ্ছাসেবকরা ব্যস্ত হাতে চেয়ার গোছাচ্ছেন। মঞ্চে তখনও সন্ধ্যের আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন কমরেড লেনিন। মাঠ জুড়ে যেন তখনও অনুরণিত হচ্ছে সেই সুর—

'উদ্বেগ, বিভীষিকা, আতঙ্ক গেছে ছেড়ে
ছেঁড়া পোষাকের মজুর দল,
তবু চোখগুলো জ্বল জ্বল,
দেখ তাদের রয়েছে হাতিয়ার— কমরেড লেনিন!'

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com